# ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠায়
## এক সর্বব্যাপী আন্দোলন

উস্তাদ শাহ্ ইদরীস তালুকদার হাফিযাহুল্লাহ

# ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এক সর্বব্যাপী আন্দোলন

**মুল**

**উস্তাদ শাহ্ ইদরীস তালুকদার হাফিযাহুল্লাহ**

**অনুবাদ**

অনুবাদ বিভাগ

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ

# ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এক সর্বব্যাপী আন্দোলন

**মূল**
উস্তাদ শাহ্ ইদরীস তালুকদার হাফিযাহুল্লাহ্

**অনুবাদ**
অনুবাদ বিভাগ
আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ

- **প্রথম প্রকাশ**
  জুমাদাল উখরা ১৪৪৪ হিজরী
  জানুয়ারি ২০২৩ ইংরেজি



- **প্রকাশক**
  উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ
  আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ
  ওয়েবসাইটঃ https://fatwaa.org
  ইমেইলঃ ask@fatwaa.org
  ফেসবুকঃ https://fb.me/fatwa.org
  টুইটারঃ https://twitter.com/fatwaa_org_1
  ইউটিউবঃ https://www.youtube.com/@fatwaa_org
  টেলিগ্রামঃ https://t.me/fatwaa_org

- **মূল্য**
  বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

# সূচিপত্র

## ভূমিকা

সম্মানিত তাওহীদবাদী ভাই ও বোনেরা! মুহতারাম উস্তাদ শাহ্ ইদরীস তালুকদার হাফিযাহুল্লাহ'র '**ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এক সর্বব্যাপী আন্দোলন**' গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান। গুরুত্বপূর্ণ এই লেখায় তিনি বাংলাদেশের মতো একটি অঞ্চলে যে কোনও ধরনের পরিবর্তন ঘটাতে হলে তাওহীদ, দাওয়াত ও জিহাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন আন্দোলন কীভাবে গড়ে তুলতে হবে, তা সংক্ষেপে এবং সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। নিঃসন্দেহে এই প্রবন্ধে আমরা আমাদের করণীয় সম্পর্কেও দিক-নির্দেশনা পাব ইনশাআল্লাহ।

এই লেখাটির উর্দু সংস্করণ ইতিপূর্বে 'জামাআত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ শাখা'র অফিসিয়াল উর্দু ম্যাগাজিন 'নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ' এর গত অক্টোবর-নভেম্বর ২০২২ ইংরেজি সংখ্যায় "এহইয়ায়ে ইসলাম কি এক হামাহগীর তেহরীক" (احیائے اسلام کی ایک ہمہ گیر تحریک) শিরোনামে প্রকাশিত হয়। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই লেখাটির মূল বাংলা অনুবাদ আপনাদের সামনে পেশ করছি। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

আম-খাস সকল মুসলিম ভাই ও বোনের জন্য এই রিসালাহটি ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে। সম্মানিত পাঠকদের কাছে নিবেদন হল- লেখাটি গভীরভাবে বারবার পড়বেন, এবং নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ এই রচনাটি কবুল ও মাকবুল করুন! এর ফায়দা ব্যাপক করুন! আমীন।

**সম্পাদক**
১৭ই জুমাদাল উখরা, ১৪৪৪ হিজরী
১১ই জানুয়ারি, ২০২৩ ইংরেজি

# ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এক সর্বব্যাপী আন্দোলন

**উস্তাদ শাহ্ ইদরীস তালুকদার হাফিযাহুল্লাহ**

এই সিরিজের আগের নিবন্ধের পরিশিষ্টে আমরা এই পর্যবেক্ষণগুলো তুলে ধরেছিলাম যে, বাংলাদেশের মতো একটি অঞ্চলে যে কোনও ধরনের পরিবর্তন ঘটাতে হলে তাওহীদ, দাওয়াত ও জিহাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সেটি হবে এমন এক আন্দোলন যা 'আল্লাহ প্রদত্ত আইন দ্বারা শাসনের অনিবার্যতা'র উপর জোর দিবে। সে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজের রোগ-ব্যাধি এবং চলমান ব্যবস্থার কুফলগুলো চিহ্নিত করা হবে; এরপর সেগুলো সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা ও বিধি-বিধান প্রচার করা হবে। একটি ইসলামী ব্যবস্থা এই সমস্যাগুলোকে কীভাবে মোকাবেলা করে এবং এমন সব সমস্যার কী সমাধান দেয় – সেটা সমাজের সামনে তুলে ধরবে। একবার যদি এই আন্দোলনটি দাঁড়িয়ে যায়, তবে তা বাংলাদেশের মুসলিমদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার আগ্রাসন ও আক্রমণ থেকেও রক্ষা করবে।

আমরা যদি এই পর্যবেক্ষণগুলোকে মেনে নিই, তাহলে আমরা এখন আমাদের আলোচনাকে এই দিকে ফেরাতে পারি যে, কীভাবে এই ধরনের আন্দোলন তৈরি করা যায় এবং কীভাবে একে প্রসারিত করা যায়।

আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এমন এক আন্দোলন শুরু করার সাথে সম্পৃক্ত, যা বাংলাদেশের মুসলিমদের আগত সমস্যাগুলোর সমাধান দিবে। কিন্তু এই আলোচনায় আমরা একটি বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত করব, যা প্রায়শ উপেক্ষা করা হয় বা যথাযথ মনোযোগ পায় না। আর তা হল - একটি সামগ্রিক ও সর্বব্যাপী ইসলামী পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা।

যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, তাই এটি সমাজের সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ সকল প্রকার সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক সমস্যা ও সম্পর্কের সমাধান ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু সম্ভবই নয়, বরং সেগুলোর সমাধান ইসলামের আলোকে করাই আবশ্যক। কিন্তু আজকের ইসলামী

আন্দোলনগুলো জনগণের সামাজিক, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক সমস্যার উপযুক্ত সমাধান দিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম।

## একটি ব্যাপক ইসলামী পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

দুর্ভাগ্যবশত, বাংলাদেশের প্রায় সকল ইসলামী আন্দোলন ও প্রকল্প জনগণের সামাজিক, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম। তারা তাদের দাওয়াতের কেন্দ্র বিন্দু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে সংঘটিত সমস্যাগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, যেমন ইবাদত ও মাসআলা-মাসায়েল। খুব কম সংখ্যক যারা এই বিষয়গুলোর বাইরে কথা বলেন, তারাও তাদের বক্তৃতাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সাজাতে ব্যর্থ হন। বেশিরভাগ আলোচকের আলোচনাতে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পুনরাবৃত্তি শুনতে পাওয়া যায়, যাতে কোনও গ্রহণযোগ্য সমাধান থাকে না।

এটা একটা বিরাট সমস্যা। এই কারণেই মানুষ যখন কোন সামাজিক, রাজনীতিক বা আর্থনীতিক সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা দিক-নির্দেশনার জন্য ইসলামী আন্দোলনগুলোর দিকে না তাকিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের দ্বারস্থ হয়। জাতীয়তাবাদী, বামপন্থী ও উদার প্রগতিশীলদের থেকে সমাধান প্রত্যাশা করে। সহজ কথায় বলতে গেলে এর অর্থ দাঁড়ায় এই - দেশের সামাজিক ও রাজনীতিক নেতৃত্ব ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেণির হাতে।

আজ আমাদের সামনে যে পরিস্থিতি বর্তমান, তা এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল। ঔপনিবেশিক আগ্রাসন এবং ইসলামী ব্যবস্থার ধ্বংসের মধ্য দিয়ে এ পরিস্থিতির সূচনা হয়। আমরা সকলেই এই বেদনাদায়ক সত্যটি সম্পর্কে অবগত যে, আজ বিপুল সংখ্যক মুসলিম ধর্মনিরপেক্ষ ও কুফরী ব্যবস্থার অধীনে বসবাস করছে। এই ব্যবস্থা মুসলিমদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

নব্য-ঔপনিবেশিক যুগে ইউরোপীয় হানাদাররা আমাদের ভূমিতে আক্রমণ করেছে, আমাদের ধন-সম্পদ লুট করেছে, শরীয়াহ ব্যবস্থার পতন ঘটিয়েছে এবং তার পরিবর্তে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। ব্রিটিশরা ইসলামিক সাম্রাজ্য

এবং এর প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। তদস্থলে ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা দাঁড় করায়।

এই অঞ্চল থেকে ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পরেও তাদের রেখে যাওয়া এই ব্যবস্থাগুলো সক্রিয় রয়ে গেছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে বিভিন্ন নামে যেসব রাষ্ট্র রয়েছে, সেগুলো আসলে নব্য-ঔপনিবেশিক যুগের রাষ্ট্রগুলোরই ধারাবাহিকতা। এটি রাজনীতিকভাবে গভীর প্রভাব ফেলেছে মানুষের উপর। তবে এর প্রভাব সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের উপর এই ঘটনা যে সব সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে রয়েছে—নেতৃত্বশীল মুসলিমদের সামাজিক ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাওয়া, ইসলামের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির পতন এবং স্থানীয় ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেণির সৃষ্টি।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য 'টমাস ব্যাবিংটন এডওয়ার্ড মেকলে' ভারতে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, যা ভারতীয়দের মগজ ধোলাই করে তাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা চিন্তাধারা দান করেছে। একজন স্বার্থপর এবং চরম অহঙ্কারী ম্যাকোলে একবার দাবি করেছিল যে,

'আমি এমন কোনও বিশিষ্ট পণ্ডিত খুঁজে পাইনি যিনি একথা অস্বীকার করবেন যে, ইউরোপের কোনও ভাল লাইব্রেরির একটি শেলফ - ভারত ও আরবের সমস্ত স্থানীয় সাহিত্যের চেয়ে বেশি মূল্য বা মর্যাদা রাখে'।

ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে চাচ্ছিল সেই শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মেকলে বলেছে:

"বর্তমানে আমাদের জন্য প্রয়োজন যতটা সম্ভব এমন এক শ্রেণি তৈরি করতে চেষ্টা করা - যারা আমাদের এবং এই লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে দোভাষীর প্রয়োজন পূরণ করবে। এমন একটি শ্রেণি যারা জাতি ও বর্ণের দিক থেকে ভারতীয় কিন্তু চিন্তা-চেতনা ও আদর্শগত দিক থেকে হবে ব্রিটিশ।"

নব্য-ঔপনিবেশিক যুগের পরবর্তী নেতারা - নেহেরু থেকে শুরু করে জিন্নাহ এবং শেখ মুজিব পর্যন্ত - সবাই এই অর্থে মেকলের সন্তান ছিল। তারা সবাই পশ্চিমা ছাঁচে নির্মিত ছিল। তারা ভিতরে-বাইরে ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। তারা চিন্তা, অনুভূতি ও

বিশ্বাসে কালো চামড়ার হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে তাদের সাদা প্রভুদের অনুসরণ করত।

এক শতাব্দীরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু এখনও উপমহাদেশের সমাজ ও রাজনীতি ব্রিটিশদের সৃষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেণির হাতে। প্রায় একশ বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ দল তাদের নিজস্ব বিশ্বাস, আদর্শ ও এজেন্ডা অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে আসছে। ফলে সামাজিক ও আর্থনীতিক বিষয়গুলোকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করার এবং ইসলামের শিক্ষায় এসব সমস্যার সমাধান খোঁজার ও উপস্থাপনের প্রবণতা ক্রমশ কমে গেছে। একইভাবে ইসলামী আন্দোলনগুলোও তাদের দাওয়াতের বিষয়গুলোকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে।

এই সকল কর্মকাণ্ডের ফলাফল হল এই - আজ অনেকেই ইসলামকে শুধু কিছু আকীদা-বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পর্কিত কিছু রীতি-নীতির সমষ্টি মাত্র মনে করে। এই চিন্তার পরিবর্তন প্রয়োজন। ইসলামের দাওয়াতকে সত্যিকারের বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত করতে হলে একে ব্যক্তি জীবনের পরিধি থেকে মুক্ত তথা প্রসারিত করতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন সঠিক আকীদা, সমাজের সংস্কার, সুন্নতের পুনরুজ্জীবন ও অনুসরণের পাশাপাশি সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক বিষয়েও মনোযোগ দেয়া।

এটা নতুন কিছু নয়। বরং বাস্তবতা হল, ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতের বিষয়বস্তু সবসময়ই এসব দ্বারা পূর্ণ ছিল। এর কারণ, ইসলাম জীবনের বিভিন্ন দিককে আলাদা ভাগে বিভক্ত করেনি। সামাজিক, রাজনীতিক, আর্থনীতিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রসহ জীবনের সকল ক্ষেত্র - একই শরীয়তের অধীন ও অনুগত।

তেরো শতক ধরে আমরা মুসলিমরা আমাদের জীবন, আমাদের সমাজ এবং আমাদের সুন্দর সভ্যতাকে ইসলামের নীতি ও শিক্ষা অনুযায়ী পরিচালনা করেছি এবং এতে জীবনের সকল দিক অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ঔপনিবেশিক আগ্রাসন এবং ঔপনিবেশিকগোষ্ঠী ও তাদের দোসর,তল্পিবাহকদের তথাকথিত আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আমরা ইসলামের সার্বজনীন ও ব্যাপক ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে গিয়েছি এবং ইসলামকে আমাদের জীবন থেকে সরিয়ে দিয়ে

কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। সুতরাং আজকে আমরা যে আন্দোলনের দাওয়াত দিচ্ছি, তা নব উদ্ভাবিত কিছু নয়। বরং আমরা ইসলামের মূল দাওয়াতের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

কথিত আছে যে, আলোচনাকে স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ পেশ করা এক্সরের মত কাজ করে। এটা আমাদের স্পষ্ট করতে হবে যে, কীভাবে একটি ইসলামী আন্দোলন সামাজিক, আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক দিকগুলোর সাথে আকীদা-বিশ্বাস, ইসলাহ, তাযকিয়াহ, সংশোধন, আত্মশুদ্ধি ও মুহাসাবাহকে একই কর্ম পরিকল্পনায় একত্রিত করতে পারে?

আমরা এই উপমহাদেশের বাংলা প্রদেশে শুরু হওয়া ‘ফরায়েজী আন্দোলন’কে উদাহরণ হিসেবে পেশ করতে পারি, যা তুলনামূলকভাবে আমাদের নিকট অতীতের ঘটনা। এই আন্দোলনটি আমাদের জন্য এমন একটি ইসলামী আন্দোলনের বাস্তব দৃষ্টান্ত যা তাওহীদ, দাওয়াত ও জিহাদের মূলনীতিকে সামনে রেখে মানুষের সামাজিক, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক সমস্যাগুলোকেও সফলভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

## ফরায়েজী আন্দোলন

ইমাম হাজী শরীয়তুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ)-এর হাতে শুরু হওয়া বাংলার ফরায়েজী আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনকালে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সুসংহত ইসলামী আন্দোলন। এটি এহইয়ায়ে ইসলামের (ইসলামী পুনর্জাগরণের) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল। হাজী শরীয়তুল্লাহ হিজাজ ভূমিতে বহু বছর শিক্ষা-দীক্ষায় কাটিয়েছেন। তৎকালীন বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক পরিস্থিতি ফরায়েজী আন্দোলনের জন্ম দেয়।

এই আন্দোলনের মূল ও প্রধান লক্ষ্য ছিল - ইসলামের মূল চেতনা ও শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করা। কিন্তু এর কার্যক্রমের পরিধি জনগণের সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও জায়গিরদারি সমস্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হাজী শরীয়তুল্লাহ ভালভাবে অবগত ছিলেন যে, তারা যাদের সংশোধনের জন্য দাঁড়িয়েছেন তাদের

সমস্যাবলী ও দুঃখ-কষ্ট এবং সরকারের দ্বারা তাদের উপর যে আর্থনীতিক শোষণ চলছে সেগুলোর ব্যাপারে চোখ বন্ধ রেখে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। তিনি জানতেন যে, মুসলিমদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি না করে (অর্থাৎ তাদের জন্য সর্বজনীন উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি না করে) প্রকৃত পরিবর্তন ও আদর্শ বিপ্লবের আশা করা অনর্থক। হাজী শরীয়তুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ যখন ইসলামের ন্যায়-ইনসাফ এবং বান্দার হকের বিষয়ে কৃষকদের মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগ শুরু করেন, তখনই তিনি এই কৃষকদের আর্থনীতিক জটিলতা ও সমস্যাবলীর সাথে জড়িয়ে যান।

## আর্থনীতিক শোষণের বিরুদ্ধে কর্ম পরিকল্পনা

১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ সরকার একটি নতুন ভূমি আইন চালু করেছিল। এটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট (Permanent Settlement Act) নামে পরিচিত। আইনটি কৃষকদের থেকে জমিদারদের অবৈধ এবং অত্যধিক কর ধার্য করাকে আইনী বৈধতা দেয়। এই আইনটি কৃষকদেরকে জমিদারদের করুণার উপর বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে। কৃষকেরা কিছুদিন পর পর রাজস্ব ও খাজনার নামে জমিদারদের লুটপাট ও নিপীড়নের সম্মুখীন হত।

দরিদ্র ও নির্যাতিত কৃষক নির্ভর অনুসারীর দলকে আর্থনীতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয় থেকে বাঁচানোর জন্য ইমাম হাজী শরীয়তুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ তাঁর ভক্ত, অনুরাগী, সহায়ক ও সমর্থক অসহায় কৃষকদের ওপর জমিদার ও নীল চাষিদের আর্থনীতিক শোষণের বিরোধিতা শুরু করেন। এইভাবে ফরায়েজী আন্দোলন শুধু ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সামাজিক বৈষম্য এবং বাংলার দরিদ্র কিন্তু দক্ষ শ্রেণি, যেমন কৃষক ও কারিগরদের আর্থনীতিক সমস্যা সমাধানেও সচেষ্ট ছিল।

ইসলামী শিক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া ফরায়েজী আন্দোলন মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে একটি জাগরণ সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনের আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা এতটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, হাজার হাজার গরীব-দুঃখী কৃষক এই আন্দোলনে যোগ দেয়। এমনকি হিন্দু কৃষকরাও ফরায়েজী আন্দোলনে জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিরোধিতা করেনি। কেউ কেউ তো এই আন্দোলনকে সাহায্য ও সমর্থনও করেছিল।

ফরায়েজী আন্দোলনের এই সংগ্রাম মুসলিম জনসাধারণকে জমিদারদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে এবং জমিদারদের দ্বারা আরোপিত অতিরিক্ত ও অবৈধ কর ও শুল্ক প্রদানে কৃষকদের বাঁধা দেয়। হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন বাংলার প্রথম সমাজ সংস্কারক, যিনি অবৈধ কর পরিশোধ না করার ব্যাপারে জনগণকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর পুত্র দুদু মিয়া (মহসিন উদ্দিন আহমাদ)ও কর না দেয়াকে জুলুম ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বানিয়ে নেন।

দুদু মিয়া খুব নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সাথে জমিদারদের লুটপাটের বিরুদ্ধে বলতেন এবং সমালোচনা করতেন। তখনকার দিনে হিন্দু জমিদারদের প্রথা ছিল - তারা দুর্গাপূজা ও অন্যান্য পূজার জন্য মুসলিম কৃষকদের থেকেও টাকা আদায় করত। দুদু মিয়া এরও বিরোধিতা করেন এবং বলেন:

“হিন্দুদের পূজা এবং অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের জন্য মুসলিমদের আর্থিক সাহায্য প্রদান - তাদের দ্বীন ও ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল, অবৈধ এবং খুব নিন্দনীয়। যে ব্যক্তি এই আচার-অনুষ্ঠানগুলোকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে, সে আসলে কাফেরদের কুফরী কাজকে সহযোগিতা ও সমর্থন করে।"

## সমাজ সংস্কার

হাজী শরীয়তুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ-এর যামানায় বাংলার মুসলিম বাসিন্দাগণ বড় দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; আশরাফ ও আতরাফ।

১.সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত তথা আশরাফ শ্রেণি। তাদের দাবি ছিল; বংশগতভাবে তারা ভিনদেশি। আরব সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের বংশীয় সম্পর্ক। তারা নিজেদেরকে সম্ভ্রান্ত শ্রেণি মনে করত বিধায় তারা অন্যদের সাথে (নিম্ন শ্রেণির লোকদের সাথে) কোন ধরনের সামাজিক মেলামেশা বা সম্পর্ক রাখতে পছন্দ করত না।

২.অন্যান্য বা নিম্ন তথা আতরাফ শ্রেণি । এদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে নিচু জাতের মনে করা হত। সম্ভ্রান্ত শ্রেণি আশরাফরা ছাড়া বাংলার অধিকাংশ মুসলিম বাসিন্দাগণ এই নিম্ন শ্রেণির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এরা কৃষি ও অন্যান্য পেশায় জড়িত

ছিল। আর এরাই ছিল হিন্দুস্থানের স্থানীয় সেসকল বাসিন্দা - যারা তাদের এলাকায় ইসলাম পৌঁছার সাথে সাথে এই দ্বীন কবুল করেছিল।

ফরায়েজী আন্দোলন প্রথমত, বাংলার মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত এই 'জাতি বৈষম্য' বা বিভক্তিকে এই বলে উৎখাত করেছিল যে, এটা ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ, উম্মতে মুসলিমার ঐতিহ্য ও আমলের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। তারা সামাজিক সমতা তথা ভ্রাতৃত্ববোধকে তাদের অন্যতম মৌলিক লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। মুসলিমদের মাঝে সমতা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা, দুঃখ-কষ্টে একে অপরের অর্থ ও সামাজিক পদ মর্যাদার দিকে না তাকিয়ে সবাইকে সমানভাবে সহযোগিতা করা—তাদের মতে—সকল মুসলিমের উপর ফরয ছিল।

ফরায়েজী আন্দোলনের এই আহ্বান মুসলিম জনসাধারণের মাঝে একতা সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে আন্দোলনের সাথে দৃঢ়ভাবে জুড়ে দেয়। এই আন্দোলনে ইসলামী আকীদা ও শিষ্টাচার অনুযায়ী সামাজিক সমতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা পূর্ববাংলার নিম্ন শ্রেণির এই মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তাদেরকে গরীব ও নির্যাতিত কৃষক থেকে প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী এক সামাজিক শক্তিতে পরিণত করে। এতে জমিদারদের মাঝে এই ভয় ঢুকে পড়ে যে, নবজাতক এই শক্তিকে খুব সহজেই তাদের অবৈধ লুটপাট দমনে ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ব্যবহার করা হবে।

দ্বিতীয়ত,ফরায়েজী আন্দোলন সমাজের এমন বহু বিদআত নির্মূলে সফলতা অর্জন করেছিল, যেগুলো তখন বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর জন্য ইমাম হাজী শরীয়তুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ মুসলিমদেরকে নিজেদের ফরয দায়িত্ব দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার ও তা আদায় করার শিক্ষা দেন। সেই সাথে অন্যান্য নব উদ্ভাবিত বিদআত ও মুসলিমদের মাঝে শিকড় গেঁড়ে বসা কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক প্রথাসমূহ বর্জন করার শিক্ষা দেন। এই কারণেই এই আন্দোলনকে 'ফরায়েজী আন্দোলন' নামে নামকরণ করা হয়।

## আন্দোলনের রাজনীতিক দিক

মুসলিমদের মাঝে প্রথমত, দ্বীনি জাগরণ সৃষ্টি, দ্বিতীয়ত,সামাজিক ও আর্থনীতিক সমস্যা দূরীকরণ ছাড়াও ফরায়েজী আন্দোলনের একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল

–তৃতীয়ত, উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করা এবং চতুর্থত,এখানে একটি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা। মূল কারণ ছিল এই - কুফরী শাসনব্যবস্থার অধীনে থেকে শরীয়তের অনেক ফরয-ওয়াজিব পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাই মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবী রহিমাহুল্লাহ -এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে হাজী শরীয়তুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ ব্রিটিশ শাসিত হিন্দুস্তানকে 'দারুল হারব' ঘোষণা করেন। পি.এন চোপড়ার মত আধুনিক কালের ঐতিহাসিক লিখেছেন:

'পূর্ব বাংলায় হাজী শরীয়তুল্লাহ'র হাতে শুরু হওয়া এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুস্তান থেকে ইংরেজদেরকে বের করে পুনরায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা ও বহাল রাখা'।

ইসলামী হুকুমত জারী করার লক্ষ্য - শুধু কল্পনা, বাসনা বা চাহিদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ শহীদ মীর নেসার আলী তিতুমীরের অনুসারী, ইমাম সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদের অনুগামী এবং ১৮৫৭ সালের আজাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণকে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এর থেকেই এই আন্দোলনে একটি বিপ্লবী কৃতিত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিশেষে উপমহাদেশে 'ইসলামের আধিপত্য' - এই আন্দোলনের বিশেষ উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়। আর সরকারও তখন আন্দোলনের কার্যক্রমকে 'ইংরেজ বিরোধী কার্যক্রম' হিসেবে চিহ্নিত করতে শুরু করে। ফলে বিভিন্ন ভাবে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতাদেরকে বন্দী ও গ্রেফতার করে।

হাজী শরীয়তুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ-এর ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র দুদু মিয়া আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ে ফরায়েজী আন্দোলন সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছায়। বলা হয় যে, দুদু মিয়ার সময় ফরায়েজী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তির সংখ্যা দুই থেকে আড়াই লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে ছিল। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি সমস্ত পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং ফরায়েজী আন্দোলন একটি দৃঢ় ও মজবুত সামাজিক ও রাজনীতিক শক্তি হিসেবে গ্রামাঞ্চলে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে থাকে।

ফরায়েজীরা সাম্রাজ্যবাদী সরকারের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পাল্টে দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত অধিকাংশ জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে চিন্তা করতো না। তাই ইংরেজদের নিয়ম-কানুনের পরিবর্তে ফরায়েজীরা তাদের

নিজেদের ব্যবস্থাকে মানুষের কাছে পরিচিত করে। ইসলামের আদল-ইনসাফের চিন্তা, সমতা, সামাজিক ন্যায় ও ইনসাফ অনুযায়ী নিজেদের অনুসারীদের জাগতিক ও আত্মিক সমস্যায় সমাধান দেয়ার চেষ্টা করতো ফরায়েজীরা।

তাঁরা নিজেদের আদালত (কোর্ট) কায়েম করেছিল। ফরায়েজী আন্দোলনের কেন্দ্রের আশেপাশে যতগুলো গ্রাম আবাদ ছিল, সেগুলোর প্রত্যেক পাঁচ-সাত গ্রাম পরে একজন করে মুন্সিকে দায়িত্বশীল বানানো হয়েছিল। তিনি ঐ গ্রামবাসীদের মাঝে দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলার ফায়সালা দিতেন। তখনকার সময়ে ফরায়েজীদের নিকট তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা, বিচারিক শর্তাবলী, নিজস্ব বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে নিযুক্ত প্রতিনিধি - এক কথায় একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার সকল অঙ্গ উপস্থিত ছিল।

আন্দোলনের নেতারা তাদের কার্যক্রমকে যথাসম্ভব স্বাধীন রাখার চেষ্টা করেছেন। সরকার, জমিদার এবং নীলকরদের পক্ষ হতে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করা হয়েছে অনেক। ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্বদের লক্ষ্য ছিল - এমন একটি সমান্তরাল সরকার গঠন করা, যা ঐ সময়ের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের উপস্থিতিতেও নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব ধরে রাখবে।

দুদু মিয়ার প্রতিষ্ঠিত সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক এবং অনুসারীদের তাঁর প্রতি প্রতিশ্রুতি ও আনুগত্য - দুদু মিয়াকে ঐ মর্যাদা দিয়েছে যা একজন ব্রিটিশ অফিসার 'বেভারিক' এর ভাষায়— দুদু মিয়াকে 'বাংলার প্রকৃত শাসক' বানিয়ে দিয়েছে। বেভারিক বলেন-

"বাকরগঞ্জ জেলায় দুদু মিয়ার প্রভাব একজন জজ বা ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়েও বেশি ছিল"।

ডা. জেমস ওয়াইজ ফরায়েজী আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৮৮৩ সালে ব্রিটিশ সরকারের জন্য এই আন্দোলনের ব্যাপারে একটি বিস্তারিত বই লিখেন। ঐ বইতে তিনি এমন কয়েকটি লাইন লিখেছেন যা এই আন্দোলনের গুরুত্ব এবং উপযোগিতা বর্ণনা করে। তিনি লিখেছেন:

"ঊনবিংশ শতাব্দীর মুহাম্মাদী জাগরণের তরঙ্গ ভারতের নতুন ইতিহাসের মহান ও স্মরণীয় ঘটনার একটি। এটা শুধু এই কারণেই নয় যে, এটি একই বিশ্বাসের পতাকা

তলে লক্ষ লক্ষ জনতাকে এক ও সংঘবদ্ধ করেছে। বরং এই জন্যও যে - এটি এমন একটি রাজনীতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টান সরকারকে হটিয়ে মুহাম্মাদী সরকার প্রতিস্থাপন করা। যেখানে সভ্যতার নিয়ন্ত্রণ থাকবে কুরআন ও তরবারির হাতে।

মাত্র কয়েকজন লোকের দ্বারা বপন করা বীজ একটি বিশাল ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। যা এখন সমগ্র পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশে) তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে। এই আন্দোলনে ভূস্বামী (জমিদার) ও ধনী শ্রেণির সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল না। সরকারেরও কোন পৃষ্ঠপোষকতা বা সমর্থন ছিল না। তা সত্ত্বেও কীভাবে এই আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণির প্রায় সকলেই এটাকে গ্রহণ করে নেয়?

এটা বুঝতে হলে আমাদের জন্য আবশ্যক হল; মুহাম্মাদী শাসনের প্রথম যুগে ফিরে যাওয়া। তাহলেই আমরা এই বাস্তবতা জানতে পারবো যে, সে যুগে জীবনের উপর ইসলামের কিরূপ প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ ও গুরুত্ব ছিল! তারা কী কী পদ্ধতি ও মাধ্যমকে ইসলামের রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করেছে – সেটাও জানতে পারবো"।

## সারকথা

সারকথা হল: এই সকল সফলতা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ফরায়েজী আন্দোলনের শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু এই আন্দোলনের এই মৃত্যু আকস্মিক বা কাকতালীয় কোন ঘটনা ছিল না।

ফরায়েজী আন্দোলনের পতনের সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মত ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সম্পৃক্ততার যোগসূত্র ছিল। শুধু কিছু ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী নেতার ধোঁকাবাজি ও অবিশ্বস্ততার কারণে প্রায় একশত বছরের দাওয়াত ও জাগরণের প্রচেষ্টার ফল বরবাদ (নষ্ট) হয়ে গেছে। এটা এজন্যই হয়েছে যে, তখনকার দ্বীনী আন্দোলনের নেতাগণ ধোঁকা ও প্রতারণার এই চাল বুঝতে অক্ষম ছিলেন।

আন্দোলনের এই পরিণতি সত্ত্বেও এর উজ্জ্বল অতীত থেকে আমরা এখনও অনেক শিক্ষা অর্জন করতে পারি। এর মধ্যে আমাদের আলোচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় হল - ফরায়েজী আন্দোলন কর্তৃক 'আকীদা, ইসলাহ, তাযকিয়াহ, আত্মশুদ্ধি ও সংস্কার'কে সামাজিক, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক পরিকল্পনার সাথে উপযোগী করার ক্ষেত্রে অর্জিত সফলতা।

জাতির মাঝে আন্দোলন তথা জাগরণ সৃষ্টি করার জন্য, তাদেরকে একটি ইসলামী ভবিষ্যতের দিকে পথনির্দেশ করার জন্য প্রথমত তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, এটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে - জাতিকে একটি বিকল্প পদ্ধতি উপহার দিতে হবে। আজ উম্মাহর কর্ণদ্বার তথা পথপ্রদর্শকদের সর্বোপরি করণীয় দায়িত্ব হল সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতিক ব্যবস্থাপনা এবং সরকার – সকল ক্ষেত্রে একটি বিকল্প পদ্ধতি উপহার দেয়া ।

আজ আমাদের কাছে এ ধরনের একটি বিকল্প পদ্ধতি উপহার দেয়ার জন্য সব কিছুই উপস্থিত আছে। চৌদ্দশত বছরের মেহনতে অর্জিত ইসলামের শিক্ষা ও ইলমের অন্তহীন সমুদ্র আমাদের জাতি-মিল্লাতের সমস্ত সমস্যার সমাধান আপন ঢেউয়ের চাদরে ঢেকে রেখেছে। এখন আমাদের দায়িত্ব - ঐ সব কিছুকে একত্রিত করে এমন চিন্তাকে নির্মাণ করা, যা বাংলার মুসলিমদেরকে আবারও ঐক্যবদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ তাদের মাঝে আন্দোলন ও বিপ্লব সৃষ্টি করবে। যেভাবে এক যামানায় ইমাম হাজী শরীয়তুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর আন্দোলনের দ্বারা বাংলার মুসলমানেরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সক্রিয় হয়েছিল, সেভাবে নতুন চিন্তার অধীনে ইনশাআল্লাহ আবারও তারা ঐক্যবদ্ধ হবে।

***